মুনীর চৌধুরীর জীবনকথা

রফিকুল ইসলাম

উনিশে মার্চ রবিবার বিকাল চারটা

মুনীর চৌধুরীকে আমি প্রথম দেখি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগ। তখন তিনি সবেমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম. এ. পড়া শেষ করেছেন। ১৯৪৭ সালের কথা, সে সময়ে আমি স্কুলের ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই আমাদের বাড়ী থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র আমার অবাধ গতিবিধি ছিল। ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ে তখন এত ছাত্র ছিলনা, ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল আরও কম, মুসলমান ছাত্রী যে কয়জন ছিলেন তাদের হাতে গোনা যেত। মুনীর চৌধুরী তখনই একটি সুপরিচিত নাম, তবে ভাল ছাত্র হিসেবে নয়, অন্য কারণে। তিনি তখন রাজনীতি করতেন, শুধু সখের ছাত্র রাজনীতি নয়, পুরোপুরী বিপজ্জনক বামপন্থী রাজনীতি। তবে কেবলমাত্র সে কারণেই তিনি সেকালে ঢাকায় খ্যাতিমান ছিলেন না। তার জনপ্রিয়তার একটি কারণ হয়তো ছিল এই যে চমকপ্রদ কিছু ছোটগল্প ও নাটিকা তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তার জনপ্রিয়তার মূল কারণ ছিল তার অদ্ভুত বক্তৃতা করবার ক্ষমতা। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় সে সময় পুরোপুরি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা শহরের বিদ্যায়তন কয়েকটিই কেবলমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। আবাসিক বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক জীবন ছিল খুবই কর্মতৎপর। নাটক, তর্ক-বিতর্ক, সাহিত্য প্রতিযোগিতা আর ক্রীড়া প্রতি-যোগিতাগুলো ছিল খুবই জমজমাট। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাহিত্য প্রতিযোগিতা আর ভোজ অনুষ্ঠানগুলো খুবই আকর্ষণীয় হত। সাহিত্য প্রতিযোগিতায় আমরা দেখেছি মুনীর চৌধুরীর আধিপত্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিভিন্ন রাজনৈতিক সভাসমিতিতে তখন শুনেছি মুনীর চৌধুরীর অনবদ্য বক্তৃতা। তিনি সেকালে ইংরেজিতে বক্তৃতা করতেন, তখনকার রেওয়াজ ছিল তাই। কিন্তু মুনীর চৌধুরীর সরস কথকতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যেত, বিশ্ব-বিদ্যালয় খেলার মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসমূহে। ক্রীড়ার অনুষ্ঠান ঘোষকরূপে

মুনীর চৌধুরী অনুষ্ঠান ঘোষণাকে এমন সরস ও কৌতূহল উদ্দীপক করে তুলতেন যে খেলার মাঠে সেটাই থাকত সব চেয়ে বড় আকর্ষণ। বলাবাহুল্য যে শীতের অপরাহ্নগুলোয় খেলার মাঠ মুনীর চৌধুরীর অনবদ্য বাংলা কথকতায় জমে উঠত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অনার্সের ছাত্র হবার আগে মুনীর চৌধুরী আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন ১৯৪১—৪৩ সালে। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৪১ সালে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি আলীগড়ে আই. এস. সিতে ভর্তি হন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন আরও যে সব বাঙ্গালী ছাত্র ছিলেন তাদের মধ্যে মরহুম এ. টি. এম. মুস্তাফা এবং জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীর কথা আমরা মুনীর চৌধুরীর মুখেই শুনেছি। ঐ তিনজনই ভাল বক্তা হিসেবে পরিচিত, জানিনা এ দক্ষতা তারা আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পেয়েছিলেন কিনা। মুনীর চৌধুরী সাহেব বলতেন আলীগড়ে যখন তিনি পড়তেন তখন তার পরিচ্ছদ ছিল শেরওয়ানি ও আলীগড়ী পাজামা। আমি কিন্তু মুনীর চৌধুরীকে গত পঁচিশ বছর ধরে সাধারণতঃ পাজামা পাঞ্জাবী-তেই দেখেছি। পরিচ্ছদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম এ জন্যে যে এ বিষয়ে বহু বছর আগের একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। আজ থেকে প্রায় বিশ পঁচিশ বছর আগের কথা, ফজলুল হক হলে কি একটা সভা ছিল, সভার শেষে সন্ধ্যা বেলা হলের সামনে মুনীর চৌধুরী একটা সাইকেল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সঙ্গে তার কিছু ভক্ত। কথা হচ্ছিল পোশাক সম্বন্ধে। মুনীর চৌধুরী তখন তরুণ যুবক, সুদর্শন, ছিপছিপে, সাইকেল ধরে দাঁড়ানো, পরনে সাদা পাজামা পাঞ্জাবী, চুলগুলো উদ্‌ভ্রান্ত, তিনি পাশ্চাত্য স্যুট কোটকে পরিহাস করে কথা বলছিলেন। তিনি বললেন স্যুট কোট পরলেই আমার মনে হয় খাঁচার মধ্যে, কারাগারে প্রবেশ করেছি। তার কিছু দিনের মধ্যেই তাকে কারাগারে যেতে হয়, সেই তার প্রথম কারাবাস এবং বামপন্থী রাজনীতির জন্যে ১৯৪৮ সালে।

মুনীর চৌধুরী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর পুত্র, তাঁর পিতা মরহুম হালিম চৌধুরী সে কালেই জেলা প্রশাসক ছিলেন, আলীগড়ের ছাত্র মুনীর চৌধুরী ছুটিতে বাড়ী এলেও আলীগড়ী চালচলন বজায় থাকত। শেরওয়ানি পাজামা শোভিত, হাতে দামী বিলাতি সিগারেটের টিন, বাবার সরকারী জিপ চালিয়ে বেড়াতেন। চলা বলা হাবভাবের মধ্যে আলীগড়ের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ একটা কৃত্রিম নবাবী চালচলন। অথচ সে মুনীর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে বামপন্থী রাজনীতি আর প্রগতি সাহিত্য সংসদে ঝুঁকে পড়লেন। পোশাক পরিচ্ছদে বাঙালী হয়ে গেলেন, সাইকেল হল নিত্য সাথী। তখন পার্টি অফিস ছিল কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে, প্রতিদিন হাতিরপুল 'দারুল আফিয়া' থেকে বা সলিমুল্লাহ

মুসলিম হল থেকে কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে সাইকেলেই যাতায়াত চলত। মাঝে মাঝে তাঁকে দেখা যেত পথ সভায় চোঙ্গা ফুঁকতে। এর মধ্যে একটা নাটকীয় বৈশিষ্ট্য আছে বৈকি। তবে রাত্রিগুলো তিনি অতিবাহিত করতেন অধ্যয়নে, কিন্তু পাঠ্য পুস্তকে নয়, বিদেশী সাহিত্য পাঠে।

বামপন্থী রাজনীতি মুনীর চৌধুরীর ধাতে সহ্য হয়নি অর্থাৎ ঐ রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ পথে তিনি বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি। ঐ রাজনীতি তিনি যতদিন করেছেন ততদিন ভীষণভাবে করেছেন। চট্টগ্রামে এবং সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে সে কারণে মুনীর চৌধুরী গোঁড়া দক্ষিণ পন্থীদের হাতে প্রহৃত হন। মুসলিম হলে সেদিন তার সঙ্গে আরও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন এ. কে. এম. আহ্সান যিনি পরে উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা হয়েছিলেন। সেদিন বিশ্ববদ্যালয়ে বাম-পন্থী রাজনীতিতে মুনীর চৌধুরীর সতীর্থ ছিলেন আখলাকুর রহমান, সরদার ফজলুল করীম এবং মুনীর চৌধুরীর ছোট বোন নাদিরা চৌধুরী। লক্ষণীয় যে আখলাকুর রহমান বা সরদার ফজলুল করীমও রাজনীতির ঐ পথ থেকে ফিরে এসেছিলেন। কেউ আগে কেউ পরে অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ কারণে আমরা মুনীর চৌধুরীকে পরবর্তী কালে যতটা অভিযুক্ত করেছি অন্যদের ততটা করিনি। বস্তুতঃ পক্ষে রাজনীতি মুনীর চৌধুরীর জন্যে ছিলনা, সে যে রাজ-নীতিই হোক না কেন। সে কারণেই সে দিন রাজনীতিক অপেক্ষা সাহিত্যিক হিসাবেই তিনি অধিকতর আদৃত হয়েছিলেন।

সে কালে ঢাকায় প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন রনেশ দাসগুপ্ত, সত্যেন সেন, অচ্যুত গোস্বামী এবং অজিত কুমার গুহ। ওরা সবাই, বিশেষতঃ প্রথম তিনজন বিশেষ এক সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী, যে দৃষ্টিতে সাহিত্য হচ্ছে রাজনীতি ও অর্থনীতির অধীন। মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী ঐ বিশেষ চেতনায় কতটা প্রভাবিত হয়েছিল বলা শক্ত কারণ পরবর্তী-কালে তাঁর সাহিত্য জিজ্ঞাসা সর্বদা রাজনীতি বা অর্থনীতির বশ্যতা স্বীকার করে চলেনি। তবে এটা ঠিক যে মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যিক জীবনের শুরুতে রনেশ দাসগুপ্ত, সত্যেনসেন এবং অচ্যুত গোস্বামী তাকে বিশেষ প্রেরণা জুগিয়ে-ছিলেন। আমার আজও প্রগতি সাহিত্য সংসদের একটি সভার কথা মনে আছে, সভাটা সম্ভবতঃ নবাবপুরে হয়েছিল, রথখোলার মোড়ে যে সাধনা ঔষধালয় আছে তার ওপরের তলায়। মুনীর চৌধুরী সেদিনকার সভায় একটা লেখা পড়ে-ছিলেন, লেখাটি নানা কারণে অভিনব ছিল, প্রথমতঃ তা তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় লেখা, দুর্ভিক্ষে শুধু অন্নের অভাবে মানুষ কুকুর বেড়ালের মতো মরেনি, বস্ত্রের অভাবে লজ্জা নিবারণ করতে না পারায় মনুষ্যত্বেরও চরম অবমাননা

হচ্ছিল। লেখাটিতে এই অবস্থাটা চমৎকারভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আমরা জানি যে মুনীর চৌধুরীর দেশ নোয়াখালি জেলায়, কিন্তু সম্ভবতঃ নোয়াখালিতে কখনও তিনি থাকেন নি, পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি নোয়াখালির উপভাষা স্বাভাবিকভাবেই শিখেছিলেন। ঐ লেখাটিতে নোয়াখালির উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল সুন্দর ভাবে। প্রগতি সাহিত্য সংসদের সেদিনের সভায় মুনীর চৌধুরী লেখাটি পড়লেন, আমরা সবাই মুগ্ধ। এবার সমালোচনার পালা, আমরা সবাই সমালোচকের কাছ থেকে রচনাটির প্রশংসা শোনবার জন্যে উদগ্রীব এবং মুনীর চৌধুরীও আশা করছিলেন যে তার লেখাটি প্রশংসিত হবে। কিন্তু সমালোচক রনেশ দাসগুপ্ত আমাদের বিমুখ করলেন। তিনি লেখাটির পুংখানুপুংখ সমালোচনার অবতারণা করে বললেন যে, এ রচনায় দুর্ভিক্ষের কারণে, বস্ত্রের অভাবে ন্যাংটো যে মানুষ গুলো, দিনের বেলায় আত্মগোপন করে থাকে, রাতের অন্ধকারে আব্রু রক্ষা করে বেরিয়ে আসে, সেই হতভাগ্যদের প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে যেন কেমন একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক, ব্যঙ্গদৃষ্টি জড়িত রয়েছে। মনে হয় যেন লেখক ন্যাংটোর দেশের মানুষগুলোর ঐ অবস্থাটা উপভোগ করছেন। বস্তুতঃ এ সমালোচনা অহেতুক ছিল না। শুধু লেখার মধ্যে নয়, শুধু কথা বার্তায় নয়, মুনীর চৌধুরীর সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীটাই ছিল কৌতুক এবং ব্যঙ্গপরিহাসময়। যারা মুনীর চৌধুরীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তারা তার ঐ বৈশিষ্ট্যটুকু বিশেষভাবে পছন্দ করতেন।

সাহিত্যিক মুনীর চৌধুরীর কাছে রাজনীতিক মুনীর চৌধুরী সেদিন পরাভূত হয়েছিল, রাজনীতি তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করেই পরিত্যাগ করেছিলেন, পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপনাকে। অধ্যাপনার পেশা সেদিন তিনি গ্রহণ না করতেও পারতেন। সেদিনকার বামপন্থী এ. কে. এম. আহ্সান বা দক্ষিণপন্থী শফিউল আজমের মতো সরকারী পরীক্ষা দিয়ে সি. এস. পি. বা পি. এফ. এস. ভুক্ত হতে পারতেন স্বচ্ছন্দে। তাহলে সেদিন থেকে বিশ বছরের মধ্যেই তিনি চীফ সেক্রেটারী বা রাষ্ট্রদূত হয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু সে পথে সেদিন তিনি যাননি। অর্থাৎ সেদিনকার উজ্জ্বল মেধাসম্পন্ন ভাল ছাত্রদের মতো সরকারী আমলা হতে তিনি পারেননি, তার রুচিতে তা বেধেছে। আমলা না হলেও আইনের উচ্চ শিক্ষা নিয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন আইনজ্ঞ হবার সমস্ত উপাদান মুনীর চৌধুরীর মধ্যে ছিল, কিন্তু ব্যারিষ্টারও তিনি হননি। সুবিধাবাদী রাজনীতি করলেতো কথাই ছিলনা, সে কালেই তিনি মন্ত্রী হতে পারতেন। তাকে রাজনীতি থেকে ফেরানোর জন্য তদানিন্তন চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমেদ তাকে সরাসরি ফরেন সার্ভিস নিয়ে নেবার টোপ ফেলেছিলেন কিন্তু মুনীর চৌধুরী সে টোপ গেলেননি। তিনি কিছুই হলেন না, তিনি অধ্যাপক হলেন,

প্রথমে খুলনা দৌলতপুর কলেজে (১৯৪৯-৫০) এবং পরে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে (১৯৫০)। তিনি দৌলতপুর কলেজে ইংরেজি ও বাংলার এবং জগন্নাথ কলেজে ইংরেজীর শিক্ষকতা করেন। সেদিনকার মুনীর চৌধুরীর এ পরিণতি অনেককে হতবাক করেছিল। সেদিনের রোমাণ্টিক নায়ক মুনীর চৌধুরী সাধারণ কলেজের সামান্য লেকচারারের পদ নিয়ে কি করে তৃপ্ত হলেন? সে কি নীড় বাঁধার জন্যে? লিলি মীর্জার সঙ্গে ইতিমধ্যেই তিনি পরিবারের অসম্মতি সত্ত্বেও বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, হয়তো সে কারণেই, হয়তো রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাবার জন্যেই। তবে একটা আকাংখা ছিল মুনীর চৌধুরীর, নাটক রচনা এবং নাটক করা, তিনি প্রায়ই বলতেন সুবিধা থাকলে নাটককেই তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন কিন্তু এ দেশে তা ছিলনা তাই হয়তো নাটক পড়াবার জন্যেই সাহিত্যের অধ্যাপনাকে তিনি বেছে নিলেন পেশা হিসেবে।

ছোট গল্প লিখে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করলেও মুনীর চৌধুরী অচিরেই নাটকে নিবিষ্ট হলেন, ছাত্রজীবনে ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়নের সময়েই তিনি বিশেষভাবে নাট্যরসিক হয়ে ওঠেন। সাহিত্যের এ বিশেষ আঙ্গিকের প্রতি মুনীর চৌধুরীর আকর্ষণের মূল শেক্সপীয়ারের অমর সৃষ্টির মধ্যে নিহিত। ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ পর্যন্ত শেক্সপীয়ার ছিল তার নিত্য সাথী, শেক্সপীয়ারের নাটক অনবরত পাঠ ও তার নব নব ব্যাখ্যায় তিনি অক্লান্ত ছিলেন। শেক্সপীয়ারের প্রতিটি নাটকের একাধিক সংস্করণ সংগ্রহ করা ছিল তার একটি বাতিক। যে দেশেই তিনি গেছেন শেক্সপীয়ারের কোন না কোন নাটকের নতুন বা পুরাতন কোন না কোন সংস্করণ তিনি সংগ্রহ করতেনই। বিদেশে যখন যে শহরে যেতেন সব ছেড়ে ছুটতেন স্থানীয় থিয়েটারগুলিতে প্রাণভরে নাটক দেখে নিতেন। এমন নাটুকে প্রাণ আমাদের সমাজে আর জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা সন্দেহ।

মুনীর চৌধুরী নাটক রচনায় হাত পাকান ঢাকা বেতার কেন্দ্রে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হলে, রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে প্রচারের জন্যে নাটকের অভাব দেখা দেয়। ঢাকা বেতারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ অমুসলমান শিল্পী সাহিত্যিক দেশ ছেড়ে চলে যান, ঢাকা বেতারে তখন প্রায় অচলাবস্থা। কলকাতা থেকে কিছু মুসলমান শিল্পী সাহিত্যিক ঢাকা এসে, ঢাকার মুষ্টিমেয় লেখক শিল্পীদের সঙ্গে একযোগে ঢাকা বেতার কেন্দ্রটি চালু রাখেন। ঢাকা বেতারের নাটক বিভাগ তখন বস্তুতঃ, নাজির আহমেদের পরিচালনাধীন ছিল। নাজির আহমেদ নাটকের জন্যে মুনীর চৌধুরীর শরণাপন্ন হন। ঘরে বসে ঢাকা

বেতারের জন্যে নাটক লিখে দেবার মতো অবস্থা তখন মুনীর চৌধুরীর ছিলনা, তাই নাজির আহমেদ মুনীর চৌধুরীকে প্রায়ই ধরে নিয়ে যেতেন নাজিমুদ্দিন রোডের ঢাকা বেতার কেন্দ্রে। সেখানে গোস্ত, পরটা, চা, পান ইত্যাদি সহ মুনীর চৌধুরীকে বসিয়ে দেওয়া হত এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এক একটি বেতার নাটক সৃষ্টি হত। সে সব নাটক নামে, বেনামে, বিভিন্ন নামে রেডিও পাকিস্তান ঢাকার প্রথম যুগে প্রচার হত। এভাবেই নাজির আহমেদ সেদিন মুনীর চৌধুরীর সহায়তায় ঢাকা বেতারের নাটক বিভাগকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

মুনীর চৌধুরী ছাত্রজীবনে অভিনয়ও করতেন, তিনি মাটির ঘর, শেষরক্ষা, বিজয়া, রাজরাজরা, প্রভৃতি নাটকে ছাত্র জীবনে অভিনয় করেছিলেন। পরবর্তী-কালে তিনি অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে তার 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকেও অভিনয় করেন। 'ভিলেন' চরিত্র রূপায়নে তিনি অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিতেন। মুনীর চৌধুরী রচিত ও পরিচালিত প্রথম নাটক আমি দেখেছিলাম 'পলাশী ব্যারাক'। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ঢাকা পূর্ব বাংলার রাজধানী হলে, কলকাতা থেকে আগত কেরানীদের স্থান সংকুলানের জন্যে পলাশী এবং নীলক্ষেত ব্যারাক স্থাপিত হল। সারি সারি বাঁশের লম্বা ব্যারাক, তার মধ্যে থাকতেন মেস করে হাজার হাজার কেরানী। পলাশী ব্যারাকে আবার কয়েকটি দোতলা ব্যারাক ছিল, এই দ্বিতল ব্যারাকগুলোর এক তলার ছাদ আর দোতলার মেঝে ছিল কাঠের পাটাতন। পাটাতনের কাঠগুলোর মধ্যেও কিছু কিছু ফাঁক ছিল, যার মধ্য দিয়ে ওপর থেকে পানি, ময়লা স্বচ্ছন্দে নীচের বাসিন্দাদের ওপরে, তাদের বিছানা পত্রে পড়ত। এই নিয়ে উভয় তলার বাসিন্দাদের মধ্যে চলত বিসম্বাদ। এই পরিস্থিতিতে কল্পিত 'পলাশী ব্যারাক' নাটিকা। নাজিমুদ্দীন-নুরুল আমিনের মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছিল ঐ নাটিকার উদ্দেশ্য। তবে ব্যারাকবাসী কেরানীদের দুরবস্থার প্রতি সহানুভূতি অপেক্ষা দোতলা পলাশী ব্যারাকের ওপর-নীচের কেরানী কোন্দলের পরিস্থিতিটার কৌতুক-ময় দিকটাই প্রাধান্য পেয়েছিল জগন্নাথ কলেজে অভিনীত 'পলাশী ব্যারাকে'।

ঢাকা শহরে তখনও সৌখিন মঞ্চে সহ-অভিনয় প্রথা প্রচলিত হয়নি, ঢাকায় সে সময়ে সখের নাটক অভিনীত হত প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে এবং নবাবপুর রেল গেটের নিকটস্থ রেলওয়ে মঞ্চে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-অভিনয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হয় ১৯৫২ সালেরও পরে। কিন্তু ঢাকায় ১৯৫০ সালে ডক্টরস ক্লাবের উদ্যোগে রেলওয়ে মঞ্চে 'বিজয়া' নাটকে সহ-অভিনয় চালু হয়। এ নাটকে মুনীর চৌধুরী অভিনয় করেছিলেন। এ নাটকে আরও ছিলেন ডাঃ শাকুর, মিসেস নূরজাহান মোর্শেদ, ডাঃ মেহেরুন্নেসা, রাজিয়া খান প্রমুখ। মুনীর

চৌধুরী যে অভিনয় করতেন তা ততটা অভিনয়ের নেশার জন্যে নয় বরং নাট্য আন্দোলনের জন্যে। বস্তুতঃ প্রথম থেকেই ঢাকার নাট্য আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন মুনীর চৌধুরী। ১৯৫১ সালে রেলওয়ে মঞ্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদের 'জবানবন্দী' নাটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম সহ-অভিনয়ে অংশ নেন। এ নাটকটির পরিচালনা করেন মুনীর চৌধুরী। নাটকের রিহার্সেল হত মুনীর চৌধুরীর নীলক্ষেতের বিশ্ববিদ্যালয় আবাসে। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চে সহ-অভিনয় স্বীকৃত ছিলনা বলেই সংস্কৃতি সংসদকে রেলওয়ে মঞ্চে যেতে হয়েছিল। এ নাটকেই আমি প্রথম মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে মঞ্চে কাজ করার সুযোগ পাই, অবশ্য নেপথ্যে।

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ দেশ বিভাগের পর দু'জন বিদেশী শিক্ষাবিদের আন্তরিক চেষ্টায় সুষ্ঠুভাবে চলছিল, তারা হলেন মিস্ এ. জি. ষ্টক ও প্রফেসার টার্নার। মুনীর চৌধুরী এ দুজন শিক্ষকেরই স্নেহধন্য ছিলেন। বস্তুতঃ এই বিদেশীদের জন্যে মুনীর চৌধুরী তার বামপন্থী ঐতিহ্য ও জেল রেকর্ড সত্ত্বেও ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পেরেছিলেন। পরে মিস্ ষ্টক ও প্রফেসার টার্নার উভয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন মিস্ ষ্টকের মতো সার্থক শিক্ষাবিদের বা টার্নারের মতো মানব হিতৈষীর স্থান হয়নি হয়েছিল নিউম্যানের মতো নাৎসী অনুচরের, যিনি বিদেশী হয়েও এ দেশের রাজনীতিতে এমন কি ছাত্র রাজনীতিতেও প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতেন। নিউম্যান সাহেবের কিছু কিছু শিষ্যকে পরবর্তীকালে 'কনভেনশান মুসলিম লীগ' ও 'শান্তি কমিটির' নেতা রূপে দেখা গিয়েছিল। নিউম্যান সাহেবকেও অবশ্য পরে এ দেশ ছেড়ে বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকায় আশ্রয় নিতে হয়। টার্নার সাহেবকে তাড়িয়ে পরে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ হন। সৌভাগ্যক্রমে মুনীর চৌধুরী তার আগেই ইংরেজি বিভাগ ত্যাগ করে বাংলা বিভাগে যোগদান করেছিলেন।

মুনীর চৌধুরী ইংরেজি বিভাগে ১৯৫০ থেকে ৫২ সাল এই দুই বৎসর শিক্ষকতা করেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা তিনি কতটা উপভোগ করতেন জানিনা তবে পরবর্তীকালে তাকে বলতে শুনেছি যে, আমাদের দেশে ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো মানেই হল ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের শব্দের অর্থ বলে দেওয়া, এর অতিরিক্ত কিছু নয়, তিনি আরও বলতেন যে ঐ সব শব্দার্থ সম্বলিত পাঠ শিক্ষককে পরিশ্রম করে প্রস্তুত করতে হয় না কারণ ইংরেজির সুসম্পাদিত

পাঠ্যপুস্তকসমূহে শব্দার্থ, ব্যাখ্যা, টিকা, টিপ্পনি সবই যথারীতি সন্নিবেশিত থাকে। তবে শিক্ষককে যথার্থ পুস্তকটি লাইব্রেরী থেকে খুঁজে নিতে হয়। তিনি পরিহাস ছলে এমনও বলতেন যে, ইংরেজি সাহিত্যের একজন কৃতী অধ্যাপক ক্লাসে পাঠ্য কোন গ্রন্থের যে বিশেষ সংস্করণটি ব্যবহার করেন সেটি ছাড়া আর সব গ্রন্থের রেফারেন্সই ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে থাকেন। আমাদের দেশে ইংরেজি সাহিত্যের পঠন পাঠন সম্পর্ক মুনীর চৌধুরীর ঐ মন্তব্য বাস্তব অবস্থার সঙ্গে কতটা সম্পর্কিত বা এর কতটা কৌতুকছলে বর্ণিত তা আমি জানিনা। তবে তিনি কখনও এমন কথা বলেননি যে তিনি ইংরেজি সাহিত্য পড়াতে ভালবাসতেন না। নাটক পড়াতে তিনি নিশ্চয়ই খুব উপভোগ করতেন। আর পরবর্তীকালে বাংলা বিভাগে শিক্ষকতার সময়েও তাকে আমরা সর্বদাই কোন না কোন ইংরেজি গ্রন্থ পাঠ করতে দেখেছি, আর তার অধিকাংশই থাকতো নাটক। শুধু বার্নার্ড শ বা শেক্সপিয়ার নয়, আধুনিক এমনকি অতি সম্প্রতি প্রকাশিত ইংরেজি নাটকসমূহ তিনি নিয়মিত সংগ্রহ করতেন এবং গভীর মনযোগের সঙ্গে তা পাঠ করে ফেলতেন। এমন কি আফ্রিকার নিগ্রো-নাট্যকারদের ইংরেজি নাটক থেকেও তাকে প্রচুর আনন্দ পেতে দেখেছি।

১৯৫২ সালে পুনরায় কারাবরণের সময় মুনীর চৌধুরী ইংরেজি বিভাগেরই অধ্যাপক ছিলেন, আটচল্লিশ সালে শুরু হওয়া রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আর মুসলিম লীগ সরকার বিরোধী বিক্ষোভ তখন বেশ তীব্রতালাভ করেছে। '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সমস্ত দেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও এর প্রতিবাদ জানানোর জন্যে একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। শিক্ষকদের এই প্রতিবাদ সভা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়নি। এই সভা ডাকতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। সেকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক দের সভা ডেকে মুসলিম লীগ সরকারের সমালোচনা করা এক কঠিন ব্যাপার ছিল। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মুসলিম লীগের লোক। সেকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পাকি-স্তানের শিক্ষা সচিব ফজলুর রহমানের চেলাদের দাপট ছিল খুবই বেশী সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে সেখানে মুসলিম লীগের সমালোচনাসভা ডাকা ছিল কত বিপজ্জনক। শিক্ষকদের ঐতিহাসিক প্রতিবাদ সভায় জড় করার কঠিন দায়িত্ব সেদিন যে দুই একজন শিক্ষক পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী, আরও ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী। শিক্ষকদের ঐ প্রতিবাদ সভায় তারা বক্তৃতা করেন এবং অনেক কষ্টে একুশে ফেব্রুয়ারীর হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করে একটি প্রস্তাব ঐ সভায় পাশ করান।

সভায় উপস্থিত নুরুল আমিনের অনুচরেরা অবিলম্বে বিষয়টি সরকারের গোচরীভূত করেন। ফল স্বরূপ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোজাফ্‌র আহমদ চৌধুরী ও অধ্যাপক পৃথ্বীশ চক্রবর্তী গ্রেফতার হন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অজিতকুমার গুহও একই সময়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন। ঐ সময়ে বন্দী হয়ে বহু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী জেলে ছিলেন যেমন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল হাশিম, মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন প্রভৃতি। মুনীর চৌধুরীর আড়াই বৎসর জেল জীবন ঢাকা, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলে অতিবাহিত হয়। এই জেল জীবনেই তিনি শেখ মুজিবর রহমান, আবুল হাশিম, অজিতকুমার গুহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। জীবনের শেষ পর্যন্ত এদের স্থান তার হৃদয়ের খুব কাছে ছিল, মুনীর চৌধুরীর প্রতিও তারা ছিলেন বরাবর আন্তরিক। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিমলীগ সরকারের পতনের পর মুনীর চৌধুরী জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

মুনীর চৌধুরীর এবারের বন্দী-দশা তার জীবনে এনে দেয় এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। বন্দী জীবনের পুরো সময়টার তিনি সদব্যবহার করেন। জেলে প্রথম শ্রেণীর কয়েদিরূপে তিনি কেবলমাত্র বাগান বা রান্না করে সময় কাটাননি বরং এই সময়টায় তিনি বাংলা সাহিত্য গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন। এ ব্যাপারে তাকে সর্বদা উৎসাহ আর প্রেরণা দিয়েছিলেন অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ। জেল থেকে তিনি বাংলাভাষা ও সাহিত্য এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে উভয় পর্বে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে যথার্থভাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনকেও তিনি ঐ সূত্রে গ্রথিত করে নিয়েছিলেন। শুধু পাঠ নয়, পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নয় এ সময়ে তিনি কিছু উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্মও করেন যেমন বার্ণাডশ'এর 'ইউ নেভার কেন টেল'-এর বঙ্গানুবাদ 'কেউ কিছু বলতে পারেনা'। 'কবর' নাটকও এই সময়েই রচিত, যে মহৎ সৃষ্টির জন্যে হয়তো তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

শুনেছি মহৎ স্রষ্টা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হন, মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকে কি তার নিজের এবং মাতৃভূমির ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ছিলনা? 'কবর' নাটক রচনার মাত্র বিশ বছরের মধ্যেই কি ঘটে গেল এ দেশে আর তার নিজের জীবনে? স্মরণ করুন 'কবর' নাটকের সে দৃশ্যের কথা, যেখানে নেতা তার অনুচরকে বলছে লাশগুলোকে তিনি হাজার হাজার হাত মাটির নীচে সব পুঁতে ফেলবেন, যাতে কোন দিন আর ওগুলো উঠে আসতে না পারে, যাতে লাশ-গুলোর কোন চিহ্ন বা কোন লেশ না থাকে। বায়ান্ন সালের 'কবর' নাটকের

ঐ দৃশ্য কি একাত্তর সালে সত্য হয়ে উঠলনা, যেখানে পাকিস্তানী নর পশুরা অগণিত গণসমাধিতে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর মৃতদেহকে পুঁতে ফেলল। যে সব গণসমাধি থেকে বহুদিন অবধি হাজার হাজার নর কংকাল বেরিয়ে আসছিল। আর 'কবরে'র রচয়িতাও হয়তো স্থান পেয়েছিলেন অমনি এক গণসমাধিতে, যার কথা তিনি 'কবর' নাটকে লিখে গেছেন কত আগে! তিনি কি 'কবর' রচনার সময় নিজের অজান্তে আপন নিয়তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন! 'কবর' নাটকের সে দৃশ্যের কথাও স্মরণ করুন যেখানে লাশগুলো জীবন্ত হয়ে কবর থেকে উঠে আসছে আর বলছে 'মিছে কথা মা। আমরা কেউ মরতে চাইনি মা। আমি বাঁচবো মা। আমি কিছুতেই মরবনা।' একাত্তর সালের ১৪ই ডিসেম্বরে পাকিস্তানী নরপশুরা আর তাদের অনুচর বদর বাহিনীর পিশাচেরা যে আমাদের শত শত বুদ্ধিজীবী ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে, পাশবিক ভাবে হত্যা করল। হত্যার আগে কারও চোখ উপড়ে নিল, কারও হৃদয়পিন্ড উৎপাটিত করল, কারও মাথা থেকে মগজ বের করে নিয়ে শিরচ্ছেদ করল, তারাওতো কেউ মরতে চায়নি, তারাও তো বাঁচতে চেয়েছিল, তারাওতো অসীম আকুলতায় স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করছিল। মুনীর চৌধুরীও মরতে চাননি, তিনিও বাঁচতে চেয়েছিলেন, স্বাধীন দেশে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে চেয়েছিলেন, সে কথাইতো তিনি 'কবর' নাটকে লিখে গেছেন।

মুনীর চৌধুরী জেল থেকে ১৯৫৪ সালে বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন একই সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব, পরীক্ষার লিখিত অংশ জেলের ভেতরেই সম্পন্ন হয়েছিল তবে মৌখিক পরীক্ষার জন্যে তাঁকে পুলিশ প্রহরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। আমার এখনও সে দিনটির কথা মনে আছে যেদিন সকাল দশটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলাভবনে মুনীর চৌধুরীকে পরীক্ষার জন্যে নিয়ে আসা হল। ১৯৫৪ সালে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মুনীর চৌধুরীর নাম কিংবদন্তির মতো সবার মুখে মুখে। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের পটভূমিকায় রাজবন্দীদের বিশেষতঃ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও অধ্যাপক অজিতকুমার গুহের মুক্তি দাবীতে পূর্ববাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত। এম. এর মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক এবং অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে এই পরীক্ষক মণ্ডলী এই বিশেষ পরীক্ষার্থীটির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সেদিন বাংলা বিভাগের এই পরীক্ষকমণ্ডলী যে অপরিসীম আগ্রহের সঙ্গে এই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বাংলা বিভাগের ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই।

সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সেদিন ভেঙ্গে পড়েছিল মুনীর চৌধুরীকে দেখবার জন্যে। সেদিন মুনীর চৌধুরীর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিতি সবার কাছে ছিল যেমন আকস্মিক তেমনি চমকপ্রদ, হঠাৎ যেন রূপকথার এক নায়ক অপর কোন লোক থেকে কিছুক্ষণের জন্যে উদয় হয়ে সবার মন জয় করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফজলুল হক, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয় ও সরকার গঠনের পর অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্য রাজবন্দীরা মুক্তি লাভ করেন। অধ্যাপক চৌধুরী জেল থেকে বেরিয়ে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সাহিত্য সম্মেলনে আমরা মুনীর চৌধুরীকে যোগদান করতে দেখি, ঐ সম্মেলনে তিনি অনুবাদ শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ব্যাপক রদবদল হয়, বিভাগীয় অধ্যক্ষ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দ্বিতীয় বার অবসর গ্রহণ করেন, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে পশ্চিম পাকিস্তান চলে যান। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মনোনীত হন। হাই সাহেব বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেই বাংলা বিভাগ পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। ডঃ জেংকিন্স তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার এবং অধ্যাপক টার্নার ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ। হাই সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ইংরেজী বিভাগ ছেড়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। সে ১৯৫৫ সালের কথা, আমি তখন এম. এ. শেষ পর্বের ছাত্র, কবি হাসান হাফিজুর রহমানও একই ক্লাসে ছিলেন। ডঃ আনিসুজ্জামান তখন তৃতীয় বর্ষ অনার্সের ছাত্র। সৈয়দ আলী আহসান আমাদের পূর্বে মধুসূদন পড়াতেন, মুনীর চৌধুরী বিভাগে যোগদান করেই মধুসূদন এবং বঙ্কিম পড়াতে শুরু করেন। মুনীর চৌধুরীর প্রথম ক্লাসটি আমরা খুব মনযোগের সঙ্গে করলাম, সেদিন তিনি মাইকেল পড়িয়েছিলেন, খুব ভাল পড়ালেন তিনি, আমরা অবশ্য মুগ্ধ হয়েছিলাম মুনীর চৌধুরীর কাছে বঙ্কিম পড়ে। পরে বুঝেছিলাম যে কবিতার চেয়ে গদ্য বিশেষতঃ উপন্যাস মুনীর চৌধুরীর বিশেষ প্রিয় আর তার চেয়েও প্রিয় নাটক। কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাস পড়াতে গিয়ে মুনীর চৌধুরীর মধ্যে যে উল্লাস যে দক্ষতা লক্ষ্য করেছি তার কোন তুলনা নেই। বঙ্কিমের উপন্যাস ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে জীবন সত্যকে তিনি যে ভাবে তুলে ধরতেন হয়ত অন্য কারো রচনা থেকে তা করা সম্ভব ছিলনা। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে ক্লাস কক্ষের মধ্যে মুনীর চৌধুরীর যে নৈপুন্য তার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যক্ষ করেছেন আমাদের দেশে তেমনটি

আর কখনও হবে কিনা জানিনা। তবে এটা ঠিক যে ক্লাস কক্ষে সাহিত্যের এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জীবনের যে ব্যাখ্যা মুনীর চৌধুরী দিতেন তার যথার্থ রস গ্রহণের ক্ষমতা ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকের মধ্যেই ছিলনা। তিনি ক্লাসে কথা বলতেন অত্যন্ত দ্রুত, ঝড়ের মত, ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীরা অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনত, অভিভূত হয়ে ক্লাস করত, কিন্তু অধ্যাপক চৌধুরীর নব নব বিশ্লেষণ থেকে, যে কোন বিষয় একটি নতুন দৃষ্টিতে দেখবার, বিচার করবার অসাধারণ ক্ষমতা থেকে তারা কতটা গ্রহণ করতে সক্ষম হত সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। অধ্যাপক চৌধুরী কেবল একজন ভাল বক্তাই ছিলেন না, ক্লাসকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবার ক্ষমতার অধিকারীই ছিলেন না, প্রতিটি ক্লাসের জন্যে তিনি অসম্ভব পরিশ্রম করতেন। তিনি যে আজ এত বৎসর ধরে বঙ্কিম পড়াচ্ছিলেন তবুও সেদিন পর্যন্ত দেখেছি বঙ্কিমের ক্লাসের আগে আবার তিনি বঙ্কিম ঝালাই করে নিচ্ছেন, আবার নতুন করে প্রস্তুত হচ্ছেন ক্লাসের জন্যে। পূর্বে আমরা যারা মুনীর চৌধুরীর সহকর্মী ছিলাম তারা কি মুনীর চৌধুরীর ঐ অভ্যাসটি কখনও অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি? আমরা মুনীর চৌধুরীর মত ভাল বক্তা হতে চেয়েছি, তার বলার ভঙ্গী অনুসরণ করতে চেয়েছি, কিন্তু তার মত পড়ুয়া, পরিশ্রমী শিক্ষক হবার চেষ্টা করিনি। সেদিন পর্যন্ত দেখেছি ক্লাস থাকলে আগের দিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত তিনি ক্লাসের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে শত কাজের মধ্যেও ক্লাসে যাবার আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত পাঠ্য বিষয়টি বার বার ঝালিয়ে নিচ্ছেন। অথচ পাঠ্য বিষয়ে তাঁর যে জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য ছিল, যে কোন বিষয় সম্পর্কে বলবার তার যে ক্ষমতা ছিল এবং বিভিন্ন ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান অর্জনে যতটুকু আগ্রহ ছিল বা জ্ঞান আহরণে যে ক্ষমতা ছিল তাতে মুনীর চৌধুরী কোন প্রকার পরিশ্রম ছাড়াও জনপ্রিয় শিক্ষক হয়ে থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা কোনদিন করেননি, তিনি ছাত্রদের কখনও ফাঁকি দেননি, প্রতারিত করেননি শিক্ষক সত্তাকে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের কথায় ভোলাবার চেষ্টা করেননি, ভঙ্গী দিয়ে প্রতারিত করতে চাননি। মুনীর চৌধুরীর বিভিন্ন পরিচয়ের মধ্যে শিক্ষক পরিচয়ই সে কারণে আসল পরিচয় এবং শিক্ষক হিসেবে মুনীর চৌধুরীর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ততদিন উদ্‌ঘাটিত হয়নি যতদিন তিনি বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা না করেছেন। বস্তুতঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকরূপেই মুনীর চৌধুরীর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছিল এর মধ্যেই তার বাগ্মীতা, ভাষাজ্ঞান, সাহিত্যবোধ, পাণ্ডিত্য আর বিশ্লেষণ ক্ষমতার যথার্থ সমন্বয় ঘটেছিল। শিক্ষকতা মুনীর চৌধুরী ভীষণভাবে উপভোগ করতেন। আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্ররা মুনীর চৌধুরীর মত শিক্ষক থেকে বঞ্চিত হলেন।

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই বিদেশ থেকে ধ্বনিতত্ত্ব উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে দেশে ফিরে এসে আমাদের নতুনভাবে ধ্বনিতত্ত্ব পড়াতে শুরু করেন। তখন থেকে বাংলা বিভাগে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব চর্চাও নতুন প্রাণ পায়। মুনীর চৌধুরীও অধ্যাপক আবদুল হাই কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে এই শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৫৬ সালে তিনি ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এর কিছুকাল পূর্বে জগন্নাথ কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বিদেশে চলে গেলে প্রথমে ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম এবং পরে আমি বিভাগে শিক্ষকরূপে যোগদান করি। একই সময়ে অধ্যাপক অজিতকুমার গুহও কিছু কাল বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছিলেন।

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর আধুনিক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন আমাদের ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল অন্যথা ঐ শাস্ত্রের বিস্ময়কর প্রসার এবং আধুনিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞান থেকে যেতাম। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের তত্ত্বগত ও পদ্ধতিগত জটিলতাকে যেরূপ দক্ষতার সঙ্গে মুনীর চৌধুরী আয়ত্ব করেছিলেন তা ঐ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞদের যথার্থভাবে বোঝান যাবেনা। কেবলমাত্র তত্ত্বগত বা পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া আয়ত্ত্ব করা নয় তা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বাংলাভাষা বিশ্লেষণের নৈপুন্যেও মুনীর চৌধুরী অপরিসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী এবং তাঁর শিক্ষক অধ্যাপক চার্লস ফার্গুসন যৌথভাবে বাংলা ধ্বনি সংগঠনের যে বিশ্লেষণ করেছিলেন সেটি ভাষা তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকা 'Language'এ প্রকাশিত হয়েছিল।

মুনীর চৌধুরী ১৯৫৮ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং পুনরায় বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন, যেহেতু আমি মুনীর চৌধুরীর স্থানে চাকুরীতে বহাল ছিলাম সে কারণে মুনীর চৌধুরী প্রত্যাবর্তন করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অস্থায়ী চাকুরীর অবসান ঘটে। আমি তখন বাংলা একাডেমীতে সহ-গবেষণাধ্যক্ষ রূপে যোগদান করি। ইতিমধ্যে দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়েছে এবং জেনারেল আইয়ুব খান দোর্দণ্ডপ্রতাপে দেশ শাসন করছেন। আইয়ুব খান পাকিস্তানের দণ্ডমুণ্ডকর্তা হয়েই প্রস্তাব করে বসলেন যে পাকিস্তানে সব কটি ভাষার জন্যে রোমান হরফ প্রবর্তন করতে হবে। এই প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি হিসাবে তিনি পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বিজ্ঞানের দোহাই দিলেন। তিনি এমনও আভাস দিলেন যে বাংলা ও উর্দুকে

এক হরফে লিখতে পারলে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের জন্যে একটি জাতীয় ভাষা সৃষ্টি করাও সম্ভব হবে। আইয়ুব খান এই প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী আইয়ুব খানের এই প্রস্তাব সমর্থন করে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচার করেন। সময়টা ১৯৫৯ সাল, তখন আইয়ুব খানের সামান্যতম বিরোধিতা করা কারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এ পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা আলোচনা করে ঠিক করলাম যে উর্দু এবং বাংলা ভাষায় রোমান হরফ প্রবর্তনের সোপারেশ সম্পর্কে আলোচনার জন্যে একটি সভা আহ্বান করা হবে এবং 'একাডেমিক' আলোচনার ছদ্মাবরণে আইয়ুব খানের ঐ প্রস্তাবের অসারতা প্রতিপন্ন করা হবে। ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্যে আমরা চারজনের বেশী পণ্ডিতকে রাজী করাতে পারিনি। উর্দু সম্পর্কে ডঃ আব্দালিব শাদানী ও ডঃ হানিফ ফউখ এবং বাংলা সম্পর্কে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই ও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী এবং ডঃ শাদানী উভয়েই বিস্তারিত যুক্তি তর্কের সাহায্যে বাংলা ও উর্দু ভাষায় রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন। ডঃ শাদানী অবশ্য পরে বেগতিক দেখে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচার করে উর্দুর জন্যে রোমান হরফ প্রবর্তন সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীকে দিয়ে সরকার ঐ কাজটি করাতে পারেননি। একই সময়ে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী আর একটি দুঃসাহসী কাজ করেছিলেন, ১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চ পূর্ব বঙ্গ সরকার বাংলাভাষা সংস্কারের জন্যে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করেছিলেন, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান ছিলেন ঐ কমিটির সভাপতি। ১৯৫০ সালের ৭ই ডিসেম্বর 'পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি' সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে ঐ কমিটি বাংলাভাষার সংস্কার করে বাংলা ভাষা থেকে 'হিন্দুয়ানী' সব কিছু বাদ দিয়ে মুসলমানী বাংলা ভাষা নির্মাণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান সরকার আট বৎসর পর্যন্ত এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেনি। আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পর ১৯৫৯ সালে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় এবং সোপারেশসমূহ কার্যে পরিণত করার চেষ্টা চলে। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সাহেব তখন বাংলা একাডেমীর পরিচালক। সরকারী কর্মচারী হিসেবে ডঃ এনামুল হকের পক্ষে ঐ সংস্কার প্রয়াসের বিরোধিতা করা সম্ভবপর ছিলনা। আমি বাংলা একাডেমীর সহ-গবেষণাধ্যক্ষরূপে ডঃ হকের অনুমোদনক্রমে বাংলা একাডেমীর গবেষণাবিভাগের পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটির প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার জন্যে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করি। আলোচনায় যোগদানের জন্যে এবারেও কেবলমাত্র অধ্যাপক মুনীর

চৌধুরীকেই রাজী করান গেল। তিনি ভাষা কমিটির রিপোর্টের কয়েক গুণ বড় কলেবরের একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন এবং পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির সংস্কার প্রস্তাবসমূহের অসারতা প্রমাণ করলেন।

১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সাল এই দশ বৎসর অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সহ-কর্মীরূপে তাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখার ও জানার সুযোগ আমার হয়। অধ্যাপক চৌধুরী ১৯৬২ সালে ৩৭ বৎসর বাংলা বিভাগের রীডার এবং ১৯৭০ সালে ৪৫ বৎসর বয়সে প্রফেসার পদে উন্নীত হন। ১৯৬১ সালে আমরা ঢাকায় রবীন্দ্র জন্ম শত বার্ষিকী উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করি, সঙ্গে সঙ্গে সরকার ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের তরফ থেকে প্রবল বাধার সৃষ্টি করা হয়। আমরা বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদকে সভাপতি ও অধ্যাপক খান সারওয়ার মোর্শেদকে সম্পাদক নির্বাচিত করে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করি। সারা বিশ্বে তখন রবীন্দ্র শত বার্ষিকী উদযাপনের প্রস্তুতি চলছিল অথচ বঙ্গ-ভাষাভাষী পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র শত বার্ষিকী উদযাপনের আবেদন পত্র স্বাক্ষর করাতে গিয়ে বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকদের কাছ থেকে যে আচরণ পাওয়া গিয়েছিল তা ছিল নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। সেদিন যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী সরকারী বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে আমাদের আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, প্রস্তুতি কমিটির সভ্য হয়েছিলেন এবং রবীন্দ্র শত বার্ষিকী অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রথম সারিতে ছিলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। রবীন্দ্র শত বার্ষিকী ছিল আমাদের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ, সে ছিল পাকিস্তানে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। আমরা যথাযথভাবে সে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করেছিলাম।

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী রবীন্দ্র কবিতার ভক্ত ছিলেন না। সাধারণভাবেই তিনি ভাববাদী কবিতার প্রতি বিমুখ ছিলেন। বরং রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা সমূহ তাকে অধিকতর আকৃষ্ট করত। কিন্তু যখনই রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী সংস্কৃতির-প্রতিভূরূপে আক্রমণের, আঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন তখনই মুনীর চৌধুরী যেমন প্রবলভাবে রবীন্দ্রনাথের জন্যে সংগ্রাম করেছেন তা রবীন্দ্র সাহিত্যের অতি ভক্তদের জন্যেও শ্লাঘার বিষয় ছিল।

মাইকেলের নাটক এবং দীনবন্ধুর প্রহসন মুনীর চৌধুরীর খুব প্রিয় ছিল, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ আয়োজিত ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহে নাটক থেকে পাঠের যে অনুষ্ঠান ছিল তাতে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রহসনটির তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কটুকু পাঠ করা হয়েছিল, এই পাঠে মুনীর চৌধুরী স্বয়ং নিমচাঁদের চরিত্র রূপায়িত করেন। নিমচাঁদের সে অনবদ্য রূপায়ণ

আজও আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। আমরা জানি নিমচাঁদ চরিত্রে মধুসূদনের ছায়াপাত ঘটেছিল আর আমার মনে হয় মাইকেলের চরিত্রের সঙ্গে মুনীর চৌধুরীর কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। মাইকেলের মতই মুনীর চৌধুরী ইংরেজি সাহিত্যের বিশেষতঃ গ্রীক নাটকের ভক্ত ছিলেন। গ্রীক নাটকের নিয়তি যেমন রাবণ চরিত্রকে তেমনি মাইকেল জীবনের পরিণতিকে বিষাদান্ত করেছিল, মুনীর চৌধুরীর জীবনেও আমরা নিয়তির নিষ্ঠুর লীলা প্রত্যক্ষ করি। মুনীর চৌধুরী যেন একটি গ্রীক নাটকের নায়ক, নিয়তির অমোঘ বিধানে অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটকেও আমরা নিয়তির প্রাধান্য লক্ষ্য করি। কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনয় করাতে গিয়েও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বিপদে পড়েছিলেন। ১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে বাংলা একাডেমী আয়োজিত তৃতীয় নাট্য মওসুমে একাডেমী মঞ্চে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক নাট্য গোষ্ঠি থেকে কৃষ্ণকুমারী নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। কৃষ্ণকুমারী নাটক বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি বিধায় বাংলা বিভাগের অনার্স শ্রেণীর পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। ১৯৬৪ সালের শুরুতে যখন মুনীর চৌধুরীর প্রযোজনায় ও আমার পরিচালনায় কৃষ্ণকুমারী নাটক মঞ্চস্থ হয় তখন ঢাকায় গভর্ণর মোনায়েম খানের ইঙ্গিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারও সূত্রপাত হয়। কৃষ্ণকুমারী নাটকে 'যবন' শব্দটির ব্যবহার আছে তবে তা খারাপ অর্থে নয় বা মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে নয়। এ দেশে কারা প্রথম গোলাপ ফুল আনয়ন করে সে প্রসঙ্গে 'যবন' শব্দটি নাটকে ব্যবহৃত। নাটকটি মঞ্চস্থ করার সময়ে আমরা শব্দটির কোন পরিবর্তন করিনি। নাটক অভিনয়ের পর পরই সংবাদটি গভর্ণর মোনায়েম খানের কানে পৌঁছে দেওয়া হয়, তিনি কৃষ্ণকুমারী নাটকটি চেয়ে পাঠান এবং কে বা কারা এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার জন্যে দায়ী তাও জানতে চান। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ডঃ ওসমান গনি। যথাসময়ে কৃষ্ণকুমারী গ্রন্থটি এবং অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও আমার নাম গভর্নরের কাছে প্রেরিত হয়। সেদিন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই আমাদের চাকুরী রক্ষা করেছিলেন কিন্তু কৃষ্ণকুমারী নাটকটি পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়েছিল।

১৯৬৭ সালে রবীন্দ্র বিতর্ক চরম আকার ধারণ করে আসে রবীন্দ্র সাহিত্য ও সংগীতের ওপর আঘাত। ঐ বৎসর জুন মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে তথ্য মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী এই অজুহাতে বেতার ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রবীন্দ্র সাহিত্য নিষিদ্ধ করার কথা ঘোষণা করেন। দেশে এ সম্পর্কে প্রবল প্রতিক্রিয়া হলেও সে প্রতিক্রিয়াকে প্রতিবাদে

রূপান্তরের জন্যে কিছু বুদ্ধিজীবীর এগিয়ে আসবার প্রয়োজন ছিল। এ সম্পর্কে ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং আমি পরামর্শ করে স্থির করি যে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচার করে সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে হবে। আমরা তিনজনে মিলে বিবৃতিটির একটি মোসাবেদা করি কিন্তু তা আমাদের মনোঃপুত না হওয়ায় আমরা মুনীর চৌধুরীর শরণাপন্ন হই। তিনি আমাদের বক্তব্য শুনে বিষয়টি অনুধাবন করে নেন এবং সঙ্গে সঙ্গে টাইপরাইটারে বসে সংক্ষেপে সুন্দর একটি প্রতিবাদ বিবৃতি তৈরী করে দেন। বিবৃতিটি ছিল এইরূপ, "স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ২৩শে জুন ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে সরকারী মাধ্যম হতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে, তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারী নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।" মুনীর চৌধুরীই বিবৃতিটিতে প্রথম স্বাক্ষর দান করেন, এছাড়া স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আরও ছিলেন ডঃ কুদরত-ই-খুদা, বেগম সুফিয়া কামাল, এম. এ. বারি, সিকানদার আবু জাফর, কবি শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান ও ফজল শাহাবুদ্দীন, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, ডঃ খান সারওয়ার মোর্শেদ, শিল্পী জয়নুল আবেদিন এবং সাংবাদিক-সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ্ কায়সার। বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের মধ্যে মুনীর চৌধুরী ছাড়াও স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, ডঃ আহমদ শরিফ, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং রফিকুল ইসলাম। বিবৃতিটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে সব মহলেই তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিরোধী শক্তিসমূহ গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। গভর্নর মোনায়েম খান উপাচার্য ডঃ ওসমান গণিকে ঐ বিবৃতির উদ্যোক্তা বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দেন। ডঃ গনি যেদিন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীকে ঐ বিষয়ে আলোচনার জন্যে ডেকে পাঠান তখন আমি তার সঙ্গেই ছিলাম। ডঃ গনি ঐ বিবৃতিটির জন্যে গভর্নর মোনায়েম খানের তীব্র প্রতিক্রিয়ার বিবরণী দিয়ে বাংলা বিভাগের কৈফিয়ৎ শুনতে চান। সেদিন মুনীর চৌধুরী অসমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে ডঃ গনিকে বলেছিলেন, 'আমরা বাঙ্গালী, সর্বোপরী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের যে মতামত তাতে লুকাবার কিছু নেই,

আমরা আমাদের মতামত প্রকাশ করে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে আমাদের কর্তব্য করেছি মাত্র।" ডঃ ওসমান গনি সেদিন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর উত্তরে বেশ বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি মুনীর চৌধুরীর যুক্তি ব্যক্তিগত-ভাবে মেনে নিয়েছিলেন তবে উপাচার্য হিসেবে তার যে কর্তব্য রয়েছে সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি। পরবর্তীকালে অবশ্য দেশে রবীন্দ্র নাথের পক্ষে প্রবল জনমত সৃষ্টি হওয়ায় মোনায়েম খান বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করার সর-কারী এবং দক্ষিণপন্থী প্রয়াসও চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়।

মুনীর চৌধুরী শুধু বাংলা ভাষা বা রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নেই নয় বাংলা হরফ সংস্কারের প্রশ্নেও আপোষ করেননি। ১৯৬৭-৬৮ সালের দিকে গভর্নর মোনায়েম খানের ইঙ্গিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ওসমান গনি বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপি সংস্কারের জন্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। বাংলা একাডেমীর তদানিন্তন পরিচালক ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ এই কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঐ কমিটি বাংলাভাষাকে সংস্কারের নামে পঙ্গু ও বিকৃত করার জন্যে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে। কমিটির তিনজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই এবং ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক কমিটির মূল রিপোর্টের সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করে এবং বাংলা ভাষা ও হরফ সংস্কারের বিরোধিতা করে একটি ভিন্ন রিপোর্ট প্রদান করেন। কিন্তু ডঃ সাজ্জাদ হোসা-য়েনের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ঐ সংস্কার প্রস্তাব-সমূহ অনুমোদন করে এবং তা চালু করার নির্দেশ দান করে। একাডেমিক কাউন্সিলের ঐ সভায় কেবলমাত্র ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই এবং অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বাংলাভাষা সংস্কারের বিপক্ষে ভোট দেন। মুনীর চৌধুরী সাহেব একাডেমিক কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন না। একাডেমিক কাউন্সিলের অন্য সব সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানরা এবং বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষেরা বাংলা ভাষাকে খর্ব করবার ষড়যন্ত্রের সমর্থন কারী ছিলেন। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের ঐ সংস্কার প্রয়াসের বিরুদ্ধে একাই লেখনী ধারণ করেন। প্রথমে ঢাকার কোন দৈনিক পত্রিকাই তার ঐ সব লেখা প্রকাশ করতে রাজী হয়নি, পরে অনেক চেষ্টার পর পাকিস্তান ফিচার সিণ্ডিকেটের সৌজন্যে 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকায় একটি এবং 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের সময় পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সংস্কার প্রয়াস অব্যাহত ছিল আর অধ্যাপক

মুনীর চৌধুরীও অসীম ধৈর্যের সঙ্গে এককভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ বাংলা ভাষা বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঐ সংস্কার প্রচেষ্টা থেকে ক্ষান্ত না হওয়া পর্যন্ত মুনীর চৌধুরীর লেখনীও ক্ষান্ত হয়নি। বাংলা ভাষার ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে তার ঐ একক সংগ্রাম থেকে বাংলা ভাষার জন্যে মুনীর চৌধুরীর অনুভূতি যে কত গভীর কত ব্যাপক ছিল তার পরিচয় পাই, সেদিন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তিনি সাহসী সৈনিকের মত একা লড়েছিলেন, যেমন তিনি লড়েছিলেন বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্যে।

জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষা প্রচলনের কথা আমরা মুখে সবাই বলে থাকি কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই তা অন্তর থেকে চাইনা। আমাদের চরিত্রের এই স্ববিরোধিতা, এই দুর্বলতা অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীই প্রথম আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। অধ্যাপক চৌধুরী এ প্রসঙ্গে প্রায়ই বলতেন 'রক্ষণশীলতার শেষ দুর্গ হল বিশ্ববিদ্যালয়', তিনি আরও বলতেন 'এই দুর্গ ভাঙ্গতে না পারলে বাংলা ভাষার প্রচলন সম্ভবপর হবেনা', রক্ষণশীলতার এই দুর্গে মুনীর চৌধুরীই প্রথম আঘাত হেনেছিলেন। বাংলা বিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে বাংলা প্রচলনের জন্যে তিনি কেবল সর্বাধুনিক বাংলা টাইপ রাইটারের উদ্ভব করেই ক্ষান্ত হননি, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার বাহনরূপে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্যে একাডেমিক কাউন্সিলে ক্রমাগত প্রস্তাবের পর প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর অধ্যাপকদের অবিমৃষ্যকারিতা এবং হীনমন্যতার জন্যে তিনি বার বার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হন, কিন্তু তাতে তিনি কোনদিন হতোদ্যম হননি, সংগ্রামে ক্ষান্ত হননি। মুনীর চৌধুরীর বাংলা প্রচলন প্রয়াস কেন সফল হয়নি আজ স্বাধীন বাংলা দেশে বসে তা আমরা সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পারছি। মুনীর চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের কায়েমী স্বার্থবাদীদের চরিত্রের স্বরূপ খুব ভালভাবেই জানতেন এবং তারাও মুনীর চৌধুরীকে তাদের এক নম্বর শত্রু বলেই জানত। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বন্দী শিবিরে আটক থাকার সময় জিজ্ঞাসাবাদের সময় টের পেয়েছিলাম যে পাকিস্তান সামরিক চক্রও বিশ্ববিদ্যালয়ে মুনীর চৌধুরীকেই এক নম্বর দুশমনরূপে জানত। বস্তুতঃ পাকিস্তানীরা এবং কায়েমী স্বার্থবাদীরা মুনীর চৌধুরীকে যথার্থই চিনতে পেরেছিল। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে 'পূর্বদেশ' পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তান'কে 'বাংলা' নামকরণের প্রস্তাবের সমর্থনে যে কয়জন বুদ্ধিজীবী বিবৃতি প্রচার করেছিলেন তাদের মধ্যে পয়লা নম্বর ছিলেন মুনীর চৌধুরী।

বস্তুতঃ পাকিস্তান সামরিক চক্র ও কোন ভুল করেনি। বন্দী-শিবিরে জিজ্ঞাসা-

বাদের সময় আমাকে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আহসানুল হককে প্রধানতঃ মুনীর চৌধুরীর কার্যকলাপ সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হয়। আমাকে পীড়ন করে সামরিক চক্র এই স্বীকারোক্তি আদায় করতে চেয়েছিলেন যে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরীর পরিচালনায় বাঙালী জাতিয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত করি, প্রেরণা যোগাই এবং নেতৃত্ব দান করি। এই স্বীকারোক্তি তারা আমার কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি, শত নির্যাতনেও নয়। তবে এটা ঠিক যে সামরিক চক্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ সম্পর্কে যথার্থ ধারণাই করেছিল।

২৫শে মার্চের কাল রাত্রির পরে অনেকেই দেশ ছেড়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কোন শিক্ষকই দেশ ত্যাগ করেননি। যারা আত্মগোপন করেছিলেন তারাও দেশের মধ্যেই ছিলেন, যারা তা করতে পারেননি তারা পাকিস্তান সামরিক চক্রের বন্দী শিবিরে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ঐ সময়ে স্বদেশে অবস্থান বিপজ্জনক জেনেও দেশ ত্যাগ করেননি। অথচ সহজেই তিনি দেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে পারতেন, সেখানে তার সমাদর তার প্রতিভা গুণেই কারও চেয়ে কম হতনা। পশ্চিম বঙ্গ থেকে সহজেই তিনি বিদেশে চলে যেতে পারতেন। আগেও তিনি কয়েকবারই সংক্ষিপ্ত সফরে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানীতে গিয়েছেন, ঐ সব দেশে অনেক শিক্ষাবিদ অধ্যাপক চৌধুরীর গুণগ্রাহী ছিলেন, তিনি ইচ্ছে করলেই যুক্তরাষ্ট্রের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসার হয়ে যেতে পারতেন এবং মুক্তি সংগ্রাম শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে উচ্চ পদ লাভ করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করলেন না, তিনি দেশে মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন এবং আল বদরের শিকার হলেন।

বিগত নয় মাস কাল অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী যে নারকীয় জীবন যাপন করেন তার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। বিভাগে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে চার জন পদচ্যুত হন, তিনজন আত্মগোপন করে থাকেন, একজন ছিলেন বন্দী শিবিরে, অধ্যাপক চৌধুরী স্বয়ং এবং অপর একজন টিক্কা খানের সতর্কবাণী লাভ করেন। হাসান জামানের নেতৃত্বে একটি পাঠ্য পুস্তক সংস্কার কমিটি বার বার পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের জন্যে চাপ দিচ্ছিল। এ অবস্থায়ও বাংলা বিভাগের পাঠ্য সূচীতে কোন পরিবর্তন তিনি আনতে দেননি। রবীন্দ্র রচনাবলীর সেট বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের ঘর থেকে অপসারণ করেননি। পরিবারেও একই অবস্থা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবধূ চট্টগ্রামে বন্দী শিবিরে আটক, পুত্র ওপারে। সবার ওপরে

অধ্যাপক চৌধুরীর মেরুদণ্ডের প্রচণ্ড বেদনা, প্রতিদিন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে রে-চিকিৎসা নিতে হত। ডঃ ফজলে রাব্বি তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা না করালে ভবিষ্যতে পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু মুনীর চৌধুরী যেন সমস্ত প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলছিলেন, পরাধীন দেশে শৃংখলিত, জীবন্মৃত মানুষের মত তিনি জীবন যাপন করছিলেন আর দিন গুণছিলেন স্বাধীনতার চরম মুহূর্তটির জন্যে আকুল আগ্রহে। এ যেন 'শাজাহান' নাটকের বৃদ্ধ শাজাহান চরিত্র, আগ্রার দুর্গের অসহায় বন্দী। মুনীর চৌধুরী বন্দী হয়েছিলেন এক প্রতিকূল পরিবেশের, এক ভয়াবহ চক্রান্তের, নিয়তি তাকে দ্রুত অনিবার্য পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছিল অথচ তা প্রতিরোধের শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

মুনীর চৌধুরী নাকি একবার বলেছিলেন যে তিনি জীবনের মোহের কাছে পরাজিত, আমি বলব জীবনের মোহের কাছে নয় তিনি পরাজিত হয়েছিলেন কর্তব্যবোধের কাছে, বিবেকের কাছে। সে কর্তব্যবোধ মাতার জন্যে, স্ত্রী-পুত্রের জন্যে, ভাই-বোনদের জন্যে, সহকর্মীদের জন্যে। যাদের পেছনে ফেলে অনায়াসে স্বার্থপরের মত নিজের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি পালিয়ে যেতে পারলেন না, সবার প্রতি তিনি কর্তব্য করে গেলেন, করলেন না শুধু নিজের প্রতি। যন্ত্রণাক্লিষ্ট শরীরটার যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থাও তিনি করেননি, কষ্ট পেয়েছেন অসম্ভব এবং তা দীর্ঘদিন অথচ তা সহ্য করেছেন, কখনও সে যন্ত্রণার কথা তিনি প্রকাশ করেননি। যন্ত্রণায় তার দেহটা বেঁকে গিয়েছিল কিন্তু কোন জরা, ব্যাধি তার মস্তিষ্ককে স্পর্শ করতে পারেনি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যা সজীব এবং সজাগ ছিল। শেষ দিকে তিনি শেক্সপীয়রের একাধিক নাটক অনুবাদ কর্মের মধ্যে ডুবে থাকতেন, এবারে আর শুধু কমেডি নয় ট্র্যাজেডিতেও হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কি জানতেন ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে আসছে তার নিজের জীবনে, তিনি কি জানতেন গ্রীক নাটকের সেই নিয়তি তাকে এক দুর্লংঘনীয় পরিণতির শেষ প্রান্তে টেনে এনেছে? আমি বন্দী শিবির থেকে বেরিয়েই মুনীর চৌধুরীকে সতর্ক করেছিলাম, তাকে বলেছিলাম যুদ্ধ শুরু হলেই অদৃশ্য হয়ে যেতে, কিন্তু তিনিতো কোথাও গেলেন না নিয়তিকেই মেনে নিলেন। মনে হয় মুনীর চৌধুরী এক ট্র্যাজেডির নায়ক। যে চরিত্রের মৃত্যু নেই, যে চরিত্র অমর, চিরঞ্জীব। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর সে চরিত্রের চলা শুরু হয়েছিল আর ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে মাত্র ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে তা জোর করে চিরকালের জন্যে থামিয়ে দেওয়া হল। থেমে যাবার মাত্র কয়েকদিন আগে ন'মাস আত্মগোপনরত বিভাগের সর্বকনিষ্ঠ সহকর্মী

আকরম হোসেনকে একটি পত্র লিখছিলেন তিনি, পত্রটিও তার জীবনের মতই অসমাপ্ত—

তোমার উভয় পত্র হস্তগত। আশ্চর্য
এখনও প্রায় সবাই জীবিত অন্তত।
রফিক কিছুকাল আটক থেকে এখন
মুক্ত যাকে বলে। অন্য দুজন অনাসক্ত
উধাও ফেরার। আমার তো বটেই,
অন্য সবার মনেও তুমি আবেগোষ
স্পন্দিত উজ্জ্বল অম্লান। বেতারে ঘোষিত
যশোহর ধূলায়িত ম্রিয়মান। আবার
কি দেখব তোমাকে চোখের সামনে,
প্রাণে মেলাব প্রাণ? তোমার কথার
রত্নভাণ্ডার ভরে তুলবে আমার
রচনা সম্ভার? কখনও কি লিখব আবার?